বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৫
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকী
আনসারউদ্দিন আনাস
মোঃ আবুল বাসার
তাবিথা ব্ল্যাক-লক

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৫
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

২৭ ডিসেম্বর ২০১৫

তাসনিম সিদ্দিকী
আনসারউদ্দিন আনাস
মোঃ আবুল বাসার
তাবিথা ব্ল্যাক-লক

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা

বৈশ্বিক শ্রমবাজারে চার দশক সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক অভিবাসন বাংলাদেশে একটি মুখ্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় পরিণত হয়েছে। অভিবাসন শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি উৎস-ই না, এটি সরকারের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরেকটি নতুন পন্থা উপস্থাপন করে। অভিবাসন সেক্টরের জন্য ২০১৫ সাল, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য একটি ঘটনা বহুল বছর। এই বছর, অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্মেলন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বাংলাদেশে আয়োজন করতে সম্মত হয়েছে। সফলতার সাথে সম্মেলনটি আয়োজনের জন্য সরকারের অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বত্তম চেষ্টা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। ২০১৫ সালে অভিবাসন খাতে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদন কিছু পদক্ষেপ উপস্থাপন করেছে; যা ২০১৬ সালে অভিবাসন সুশাসনে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সেকশন-১

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন ২০১৫

১.১ পরিসংখ্যান

২০১৫ সালে, জানুয়ারী থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ লক্ষের অধিক বাংলাদেশি কর্মী উপসাগরীয় ও অন্যান্য প্রধান গন্তব্য দেশে অভিবাসন করেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে এ বছর অভিবাসনের প্রবাহ গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পাবে। বস্তুত, অভিবাসনের প্রবাহ গত চার বছরের তুলনায় অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ২০১৩ সালের প্রবৃদ্ধির তুলনায় প্রায় ৩৫% বেশি। ২০১৩ সালে মোট ৪০৯,২৫৩ জন কর্মী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে যান। গত বছর মোট ৪২৫,৬৮৪ জন কর্মী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছেন। ২০১৫ সালে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫,৩৮,৬৬৭ জন কর্মী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসন করেছে।

আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনার ফাঁক বিগত বছর গুলোতে অভিবাসন বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, আরব বসন্ত বাংলাদেশ ও অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশগুলোর নীতি পরিবর্তন এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সরকারের সাথে সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়া যেমন- মালেশিয়ার ঘটনা, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা, লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা এদের মধ্যে অন্যতম। এখন প্রশ্ন ওঠে, আন্তর্জাতিক পরিবেশ একই থাকার পরও কিভাবে এ বছর অভিবাসনের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে?

বিএমইটির তথ্য ভান্ডার হতে আমরা বলতে পারি যে, ১৯৭৬ থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ কোটির কাছাকাছি লোক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে অভিবাসন করেছে। কিন্তু, বাংলাদেশে ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য সংরক্ষণের কোন প্রক্রিয়া নেই। সরকার, নাগরিক সমাজ, এবং বিশেষজ্ঞদের সবাই ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য জানতে আগ্রহী। তবুও ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য সংরক্ষণের কোন পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি *এসডিসি* ও রামরু পরিচালিত খানা জরিপে দেখা যায় যে,

অভিবাসী পরিবার গুলোর মধ্যে ৯% হচ্ছে ফিরে আসা অভিবাসী। এই গবেষণায় শুধু তাদেরকেই ফিরে আসা অভিবাসী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যারা গত ১০ বছরের মধ্যে ফিরে এসেছে এবং বাংলাদেশে ১ বছরের বেশি সময় ধরে অবস্থান করছেন। বিএমইটির তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, গত ১০ বছরে মোট ৫,৫০,৪৬২৪ জন কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন করেছেন। যদি তাদের মধ্যে ৯% ফেরত আসে, তাহলে আমরা বলতে পারি, গত ১০ বছরে ৪৯৫,৪১৬ জন কর্মী ফেরত এসেছেন।

১.২ নারী অভিবাসন ২০১৫

বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসনের ইতিহাসে এই প্রথম ২০১৫ সালে নারী অভিবাসীর সংখ্যা ১ লাখে পৌঁছতে পারে। গত কয়েক বছরে নারী অভিবাসসনের যে চিত্র, তার মধ্যে নারী অভিবাসনের এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৯১ হাজার ৮ শ' ৫৮ জন নারী চাকরি করার জন্য ইতোমধ্যে বিদেশে গেছে; যা সর্বমোট অভিবাসীর মধ্যে ১৯ শতাংশেরও বেশি। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৬ হাজার ৭ জন নারী অভিবাসন করেছিলেন এবং তাও ছিলো এর পূর্বের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি।

১.৩ গন্তব্য দেশ

সকল অভিবাসীর গন্তব্যঃ বাংলাদেশ থেকে বেশির ভাগ স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসন করেন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০১৫ সালে মোট অভিবাসীর প্রায় ৮০% আরব উপসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছেন। ১৯৭৬ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসনের হার মোট অভিবাসনের প্রায় ৮২ ভাগ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে এ অভিবাসনের হার ১৮ ভাগ। মধ্যপ্রাচ্যে সর্বোচ্চ অভিবাসন ঘটে ১৯৯১ সালে প্রায় ৯৭.৩০% এবং সর্বনিম্ন ২০০৭ সালে ৫৮.১০%।

এবার আমরা দেখি ২০১৫ সালের দৃশ্যপট। ২০১৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করেছেন ওমানে। এ বছরের ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ১ লাখ ২৫ হাজার ৪৯২ জন কর্মী গিয়েছেন, যা বাংলাদেশ থেকে এ বছরের মোট প্রেরিত কর্মীর ২৩% শতাংশ। ২০১৪ সালেও ওমান ছিলো সর্বোচ্চ অবস্থানে। গত বছরের তুলনায় ওমানে এ বছর অভিবাসন বেড়েছে ৯ শতাংশ। গত বছরের মতোই ২০১৫ সালেও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাতার। বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার ৫৭৯ জন শ্রমিক কাতারে অভিবাসন করেছে; যা বংলাদেশ থেকে মোট অভিবাসনের ২২.৪ শতাংশ। এই সংখ্যা গত বছরের থেকে ৯ শতাংশ বেশি। এই বছর সৌদি আরবে অভিবাসন বৃদ্ধি উল্লেখ করার মতো। চলতি বছর ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ৫৫ হাজার ৪২৮জন কর্মী গেছেন। ফলে বাংলাদেশ থেকে কর্মী গ্রহণের ক্ষেত্রে গত বছরের তৃতীয় অবস্থানে থাকা সিঙ্গাপুরকে পেছনে ফেলে সৌদি আরব এবার তৃতীয় অবস্থানে। বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে গেছে এ বছর মোট অভিবাসন প্রায় ১০.২২ শতাংশ; যা বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ।

সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ থেকে ৫৪ হাজার ৬৩ জন কর্মী গ্রহণ করে চতুর্থ অবস্থানে আছে; যা এ বছর বাংলাদেশ থেকে মোট অভিবাসনের ১০ শতাংশ। যাহোক, সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ থেকে গত বছর (২০১৪) যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করেছিলো, তা থেকে ১.৩ শতাংশ কম। বাংলাদেশ সরকার মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে জি২জি পদ্ধতি পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। এই বছর মালয়েশিয়ায় শ্রমিক

অভিবাসনের প্রবণতা লক্ষণীয় মাত্রায় চোখে পড়েছে। ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মোট ২৮ হাজার ৬শ' ২৬ জন শ্রমিক মালেশিয়ায় গেছেন; যা গত ৭ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সংখ্যা ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট অভিবাসনের ৫.৩ শতাংশ। সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার বাংলাদেশ থেকে পুরুষ শ্রমিকদের অভিবাসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল রেখেছে। এই বছর মাত্র ২৪ হাজার ৮৯৮জন শ্রমিক সংযুক্ত আরব আমিরাতে অভিবাসন করেছে; যার মধ্যে প্রায় ৯২ শতাংশই নারী।

নারী অভিবাসীদের গন্তব্য দেশসমূহ: বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের জন্য প্রধান চাকরির বাজার হচ্ছে উপসাগরীয় এবং অন্য আরব দেশসমূহ। আগের বছরের ন্যায়, ২০১৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের জন্য এককভাবে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য দেশ। চলতি বছর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২২ হাজার ৮ শ' ৬৫ জন নারী শ্রমিক সংযুক্ত আরব আমিরাতে অভিবাসন করেছেন; যা বাংলাদেশ থেকে এবছর যতজন নারী শ্রমিক অভিবাসন করেছেন, তার ২৫ শতাংশ। বাংলাদেশ হতে মোট নারী অভিবাসীর ২১.৬৯ শতাংশ গ্রহণ করে জর্ডান রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে এবং ১৬.৮৮ শতাংশ নারী শ্রমিক গ্রহণ করে ওমান রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। এরপর যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও ৭ম স্থানে আছে সৌদি আরব (১৬.৪ শতাংশ), লেবানন (৯.১ শতাংশ), কাতার (৮.৭৬), এবং মরিশাস (১.৩)। বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের এক নতুন চুক্তির ফলে এ বছর সৌদি আরবে নারী অভিবাসনের সংখ্যা ৯০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সিরিয়া থেকে লেবাননের নারী শ্রম বাজারে সিরীয় নারীদের সম্পৃক্ততা স্বত্তেও সিরিয়ায় যুদ্ধাবস্থার কারণে অভিবাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের জন্য লেবানন এখনো একটি স্থিতিশীল বাজার।

গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার দেশসমূহে কর্মী প্রেরণ ছিল বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের বিষয়। অভ্যন্তরীণ ও জাতিগত সংঘাতের কারণে ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ সরকার লিবিয়ায় শ্রমিক পাঠানো বন্ধ করে দেয়। চলতি বছর ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ২৩১ জন মানুষ বাংলাদেশ হতে লিবিয়ায় গেছে। যাহোক, প্রায় ১৪ হাজার মানুষ ২০১৫ সালে ইরাকে অভিবাসন করেছে; যা মোট অভিবাসনের প্রায় ২.৬ শতাংশ। ইরাকের মূল অংশজুড়ে বিদ্যমান সঙ্কট এবং স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ঝুঁকিপূর্ণ ইরাকে অভিবাসনের অনুমোদন দেয়া বাংলাদেশী অভিবাসীদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

১.৪ সৌদিতে নারী শ্রমিক বাড়ছে

সৌদি আরবে বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির সাথে সাথে সেদেশে তাদের সুরক্ষার জন্য সরকারের দায়িত্বও বেড়ে যায়। সম্প্রতি, বাংলাদেশী নারী অভিবাসীদের ওপর কিছু কিছু নির্যাতনের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়গুলোতে সরকারের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

১.৫ রেমিটেন্স

২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ১৪.০৪ বিলিয়ন ইউ এস ডলার রেমিটেন্স হিসেবে বাংলাদেশে এসেছে। এই ধারা যদি ডিসেম্বর মাসে চলামান থাকে তাহলে গত বছরের তুলনায় প্রায় ১.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে; যা ১৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এই প্রবণতা থেকে বলা চলে রেমিটেন্স প্রাপ্তি দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের যে অবস্থান তাতে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে, এ বছর অভিবাসী শ্রমিক কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মূল

কারণ ছিলো বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে তারতম্য। হতাশাজনক বিনিময় হারের কারণে একদিকে রেমিটেন্সের পরিমাণ কমেছে, অন্যদিকে বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণকে অনুৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ও মালয়েশিয়া থেকে রেমিটেন্স প্রবাহকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে মুদ্রা বিনিময় হার। এমতবস্থায় শুধুমাত্র অভিবাসী কর্মী কর্তৃক প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিনিময় হার নির্ধারণ করা জরুরী। এছাড়াও রেমিটেন্সভিত্তিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বিনিময় হার প্রদানে বিশেষ ছাড় প্রদান করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

গত বছরের মতো এবছরেও বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরনকারী দেশ সৌদিআরব (২১.৪৯ শতাংশ); যার পরেই আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৮.১৪ শতাংশ) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৬.১১ শতাংশ)। যদিও এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী পরিমাণ রেমিটেন্স সৌদি আরব থেকে আসে, কিন্তু প্রতি বছরই এর মোট শতাংশ কমছে। গত বছরগুলোতে মোট রেমিটেন্সের ৫০ ভাগ সৌদি আরব থেকে এসেছে, পক্ষান্তরে এটি এবছর ২১% এ দাড়িয়েছে। মালয়েশিয়া থেকে ২০১৫ সালে গত বছরের তুলনায় রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে।

চলতি বছর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মোট রেমিটেন্সের ৯.১% এসেছে মালেশিয়া থেকে। মোট রেমিটেন্সের ৬% এসেছে ওমান থেকে; যেটি পূর্বের বছরের সাথে মিল রয়েছে। এ বছর মোট রেমিটেন্সের ৬.৮% রেমিটেন্স এসেছে কুয়েত থেকে। এটি গত বছরের তুলনায় ১.৫% বেশী।

এটি লক্ষণীয় যে, যদিও কয়েক বছর ধরে ওমান, কাতার এবং সিঙ্গাপুর সর্বোচ্চ শ্রমিক গ্রহণকারী দেশ তথাপি এখনও মোট রেমিটেন্সের খুব অল্প পরিমাণ রেমিটেন্স আমরা এসকল দেশ থেকে পাচ্ছি। বাংলাদেশে ৬% ওমান থেকে, ২.১ শতাংশ কাতার থেকে এবং ২.৬৭% সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে।

সেকশন-২

২০১৫ সালে অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

২.১ অনিয়মিত অভিবাসন এবং সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রা সঙ্কট

২০১৫ সালের অভিবাসন ক্ষেত্রে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো অবৈধ অভিবাসন। এ বছরই আবিস্কৃত হয় বাংলাদেশী অভিবাসী এবং মিয়ানমারের শরণার্থীদের গণকবর ও কারাগারে বন্দিদের মানবেতর জীবন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) হিসেবে ২০১৪ সাল থেকে প্রায় ৯৫ হাজার শরণার্থী এবং অভিবাসী বাংলাদেশ অথবা মায়ানমার থেকে সমুদ্রপথে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করেছে, যার মধ্যে ২০১৫ সালের প্রথমার্ধেই ৩১ হাজার। চলতি বছরের মে' মাস থেকে সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রার কোনো খবর পাওয়া না গেলেও এই সংখ্যাটি ২০১৪ সালের প্রথম ৬ মাসের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেশি। গত দু'বছরে এই পথে প্রায় ১১শ'র বেশি মানুষ মারা গেছেন, যার মধ্যে ২০১৫ সালে মারা গেছেন ৩৭০ জন।

পুলিশ সদর দপ্তরের মনিটরিং সেলের তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সাল থেকে মানবপাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত ২৫০১টি মামলার মধ্যে মাত্র ৬৮৮টি মামলার সুরাহা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে মানবপাচার 'ব্যবসা' চালু

হওয়ার পর থেকে কতজন মানুষ অভিবাসনের চেষ্টা করেছে, কতজন মারা গেছে আর কতজন নিখোঁজ হয়েছে, তার সঠিক কোনো সমন্বিত তথ্য পাওয়া যায় না।[১]

২.২ মালয়েশিয়ায় অভিবাসন ও জি-টু-জি প্লাস সমঝোতা স্মারক

বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে ৪ বছরের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর ২০১২ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকার জিটুজি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। যদিও জি টু জি (G2G) চুক্তি অনুসারে আনুমানিক মাত্র ১০, ০০ শ্রমিক মালয়েশিয়াতে যেতে পেরেছিল, যা শুধুমাত্র চাষাবাদ খাতে কাজ করার জন্য। ২০১৫ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; যা জি টু জি প্লাস (G2G+) নামে পরিচিত। এর পরপরই, মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা দেন যে, তার সরকার নতুন চুক্তির অধীনে পরবর্তী তিন বছরে বেসরকারী খাতে ১.৫ মিলিয়ন (১৫ লক্ষ) বাংলাদেশী শ্রমিককে নিয়োগ দিবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, আগস্ট মাসের শুরুর দিকে মালয়েশিয়া সরকারের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারী নিয়োগকারী সংস্থা (রিক্রুটিং এজেন্সী) সাথে সাক্ষাত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যকার স্মারক চুক্তির খসড়া; যেটি গত ৯ নভেম্বর মন্ত্রীসভায় উত্থাপিত হওয়ার কথা ছিলো, তা শেষ মূহুর্তে বাদ দেয়া হয়।[২] ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, মালয়েশিয়ায় এই নতুন বাজার উন্মোচনের ক্ষেত্রে উভয় দেশের সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান এ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। এই সিন্ডিকেশন, প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ কওে, অভিবাসন ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে।

২.৩ মালয়েশীয় সরকারের অনিয়মিত অভিবাসী বহিস্কারের সিদ্ধান্ত

অতি সম্প্রতি মালয়েশীয় সরকার সে দেশে অবস্থিত বাংলাদেশী অনিয়মিত কর্মীদের আগামী জানুয়ারী থেকে বহিস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। যাদেরকে অবৈধ বিবেচনা করা হচ্ছে, তাদের অনেকেই বৈধ ভিসা নিয়ে মালয়েশিয়া গেছিলেন। পরবর্তীতে, নিয়োগকর্তারা তাদের কাজ দিতে না পারায় তারা অন্যত্র কাজ নিতে বাধ্য হন এবং এ প্রক্রিয়ায় অবৈধ হয়ে পড়েন। এছাড়া, সমুদ্র পথে যাওয়া অনেক অভিবাসী এর ফলে বিপদে পড়েন। মালয়েশিয়ায় থাকা এই বাংলাদেশী কর্মীদের অসুবিধাগুলো মালয়েশীয় সরকার যেনো মানবিকভাবে বিবেচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেজন্য মালয়েশীয় সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আলোচনা করা উচিত এবং তাদের নিয়মিত অভিবাসীর মর্যাদা দেওয়ার জন্য মালয়েশীয় সরকারকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

২.৪ পুরনো শ্রম বাজারে পুন:প্রবেশের চেষ্টা

এই বছর, বাংলাদেশ তার তিনটি চিরাচরিত শ্রম বাজারে পুন:প্রবেশের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে। এই বাজারগুলো হচ্ছে কুয়েত, সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়া। দীর্ঘ আট বছর পর কুয়েত সরকার ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ দেয়া পুনরায় শুরু করেছে। ২২ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, সর্বমোট ১৬,৮৩৩ জন শ্রমিক কুয়েতে গেছেন; যা দেশের মোট অভিবাসনের প্রায় ৩.৫%। কুয়েত সরকার একবার ২০০০ সালের শুরুর দিকে এবং আরেক বার ২০০৬ সালে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে; যার কারণ ছিল একটা খুনের ঘটনা এবং বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাদের নিয়োগদান পদ্ধতিতে অসদোপায় অবলম্বন। নিষেধাজ্ঞার পূর্বে কুয়েত মধ্যপ্রাচ্য ও

[1] দি ঢাকা ট্রিবিউন, জুলাই ১৩, ২০১৫

[2] দি ডেইলি ওবজার্ভার, নভেম্বর ৯, ২০১৫

উপসাগরীয় এলাকায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান গন্তব্যদেশ। প্রক্রিয়াটি সচল রাখার জন্য কুয়েত সরকারের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৮,৬২১ জন শ্রমিক বৈধ উপায়ে মালয়েশিয়া গেছেন। এটি দেশের মোট অভিবাসনের প্রায় ৫.১৮%। জি টু জি (G2G) পদ্ধতি বিলুপ্তির পরপরই এই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এই বছরের জুন মাস থেকে, প্রতি মাসে গড়ে ৩,০০০ শ্রমিক মালয়েশিয়ায় অভিবাসন করেছেন। এর বিপরীতে, এই বছরের প্রথম ছ'মাসে গড়ে মাত্র ১৫০ জন করে শ্রমিক মালয়েশিয়ায় অভিবাসন করেছেন।

২০১৫ সালের ২২ ডিসেম্বর নাগাদ, সর্বমোট ৫৪,৭৫৬ জন শ্রমিক সৌদি আরবে অভিবাসন করেছেন, যা এ বছরের সর্বমোট অভিবাসনের ১০.২২%। গত বছর অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০,৬৫৭; যাদের অধিকাংশই ছিল নারী। উপরন্তু, এ বছরের অভিবাসী শ্রমিকদের একটি বিশাল অংশ পুরুষ (৭৫.৫%)।

২.৫ বাংলাদেশী হতে অনিয়মিত অভিবাসনের নতুন পথ

বেসরকারী সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং সরকারী সংস্থাগুলোর ধারাবাহিক সচেতনতা কার্যক্রম সত্ত্বেও অবৈধ/অনিয়মিত অভিবাসন একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ২০১৫ সালে একটি নতুন অনিয়মিত অভিবাসনের পথ চালু হয়েছে। ইউরোপীয় অঞ্চলে সিরিয়ার শরণার্থীদের অভিবাসনের পাশাপাশি বাংলাদেশী অভিবাসীদের অবৈধ উপায়ে ইউরোপে প্রবেশ করাচ্ছে। প্রথমে পর্যটক ভিসায় তাদের সুদানে পাঠানো হচেচ্ছ। সেখান থেকে মানবপাচারকারীদের সহায়তায় সীমানা অতিক্রম করে লিবিয়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। সময় ও সুযোগ মতো তাদের কেউ কেউ ইউরোপে যাবার চেষ্টা চালান। এ বছরের নভেম্বর মাসে, গ্রীস-মেসিডোনিয়া সীমানায় ৩৯ জন বাংলাদেশী আমরণ অনশন করেন। তারা কিভাবে সেখানে পৌঁছাল, কারা তাদেরকে সাহায্য করল এবং কেন তারা মেসিডোনিয়ান সীমানায় আটকা পড়লেন- এ ব্যাপারে কেউই কোন তথ্য জানেন না।

২.৬ অভিবাসন ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অভিবাসনকে বাংলাদেশ সরকারের পূর্ববর্তী কৌশলপত্রের তুলনায় অধিক গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবার, সর্বমোট ৩০টি ব্যাকগ্রাউণ্ড পেপারের তৈরি করা হয়েছে; যার একটি ছিল আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ওপর।

উন্নয়ন কৌশলে অভিবাসনকে মূলধারায় আনার ক্ষেত্রে, অভিবাসনকে শুধু একটি খাত হিসেবে বিবেচনা না করে, পরিকল্পনা পত্রের সকল কার্যসম্পাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সংযুক্ত করতে হবে। যাহোক, এসব ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার বিশ্লেষণ করে আমরা অনুভব করেছি যে, অভিবাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব অনুযায়ী তুলে ধরা হয়নি। অভিবাসন, রেমিটেন্স এবং অভিবাসী এ শব্দগুলো ২৫ টি ব্যাকগ্রাউণ্ড পেপারে ১৬৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর পাশাপাশি, শিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়ে শুধুমাত্র একবার অভিবাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করে নীতিবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসনের গুরুত্ব সম্পর্কিত সমৃদ্ধ উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও এবং অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের ভোগ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের বিশেষ আচরণ পরিলক্ষিত হওয়ার পরেও, এ ঘটনা হতাশাজনক। অভিবাসনের ওপর নির্ধারিত অধ্যায়টিতেও অভিবাসনকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় মূলধারায় আনয়নের ওপর আলোকপাত করা হয় নি। সাউথ-সাউথ সহযোগীতা কৌশল, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার, সমতা ও উন্নয়ন ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমূহে অভিবাসনকে খুব কম গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা

হয়েছে। যাহোক, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের ওপর জনসংখ্যাতাত্ত্বিক রুপান্তর ইত্যাদি অভিবাসনকে একটি বিকল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এর পূর্বের পরিকল্পনার তুলনায় যথেষ্ট সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু, গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটিতে অভিবাসনকে উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি অনুপস্থিত থেকে গেছে।

২.৭ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: বাংলাদেশের ভূমিকা

জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থনে গৃহীত সর্বশেষ "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়" অভিবাসনকে যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেহেতু জাতিসংঘ উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বৈশ্বিক অভিবাসনের পক্ষে বাংলাদেশের ভূমিকা আরোপ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশনের আর্থিক সহযোগিতায়, ২৮-২৯ এপ্রিল, ২০১৪ তে "Global Expert Meeting on Migration in the Post-2015 Sustainable Development Agenda" শীর্ষক একটি সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখান থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ঢাকাতে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ সভা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অভিবাসনের ভূমিকাকে জোরদার করতে এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিকল্পনায় অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি জোরদার করতে সহায়তা করে। সভাটিতে অভিবাসন নতুন উন্নয়ন কর্মসূচীতে যেসব বিষয়ে অবদান রাখতে পারে, যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং যথাযোগ্য সম্মানজনক কাজ, এবং জাতিসংঘ কর্তৃক অন্তর্ভুক্তি সম্পাদনের মাধ্যম ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা হয়। ২০১৫-পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অভিবাসন এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সভাটি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি এবং অংশীদারদেরকে একই স্থানে নিয়ে আসে। সভাটিতে ৬০টি সদস্য রাষ্ট্রের চাহিদা স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়; যা অভিবাসনকে এসডিজিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দেয়। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচীতে অভিবাসনকে বিশেষ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্তজর্জাতিক সম্প্রদায়কে অভিহিত করার লক্ষ্যে, সভা থেকে পাঁচটি বড় বিষয়- স্বাস্থ্য, উন্নয়ন এবং শিক্ষা ইত্যাদির ওপর ছয়টি পরামর্শ দেয়া হয়; যা পরবর্তীতে এ বছর জাতিসংঘ কর্তৃক এসডিজিতে গৃহীত হয়।

সেকশন-৩

আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

৩.১ মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের ব্যবহার বন্ধ

আন্তজার্তিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন- আইসিএও) ঘোষণা দিয়েছে যে, এই বছরের ২৪ নভেম্বের থেকে হাতে লেখা পাসপোর্ট আন্তর্জাতিক ভ্রমনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। মালয়েশিয়ার *আইআরআইএস* কর্পোরেশন বারহাদ (Berhad) মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশী কর্মীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এরআরপি) প্রদানের চুক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু তারা এখনো প্রায় ৫ লাখ লোককে এমআরপি বা মেশিনে পাঠযোগ্য পার্সপোর্ট প্রদানে অসর্মথ। এ কাজের জন্য তারা পাসপোর্ট ফি এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ যে টাকা সংগ্রহ করেছিল; যার পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করার কথা তা তারা করছে না। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তজার্তিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা

(ইন্টারন্যাশনালসিভিলএভিয়েশনঅর্গানাইজেশ-আইসিএও) কে হাতে লেখা পাসপোর্ট ব্যবহারের সময়সীমা দুই বছর বৃদ্ধি করার অনুরোধ করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগ (ডিআইপি) নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার মাত্র ২ দিন আগে ২২ নভেম্বর এ অনুরোধ করেছিল। আইসিএও জানায়, এ সময় বৃদ্ধি করার তাদের এখতিয়ারের বাইরে। তারা দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিস্ট সকল সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব করে।

সেকশন-৪

সেবাদানকারী সংস্থা

৪.১ ওয়েজ আর্নারস ওয়েলফেয়ার ফান্ডঃ

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলকে আরও অভিবাসী কেন্দ্রীক করার জন্য রামরু দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানিয়ে আসছে , যেহেতু এই তহবিলটির সৃষ্টি হয়েছে অভিবাসীদের অবদানের মাধ্যমে, তাই এটি নিশ্চিত করতে হবে যেন অভিবাসী এবং তাদের পরিবার যেন এর মাধ্যমে সরাসরি লাভবান হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ তহবিল মূলত ব্যবহৃত হয়েছে এমন সব কাজে; যার অর্থের যোগান হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব বাজেট হতে। ওয়েজ আর্নারস ওয়েলফেয়ার তহবিল খরচ হয় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওয়েলফেয়ার ডেস্কের নির্মাণ এবং পরিচালনার কাজে, অভিবাসীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনে, অভিবাসীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট সংরক্ষনে, স্মার্ট কার্ড প্রদানে এবং বাংলাদেশী দূতাবাসের কর্মচারীদের বেতন দান এবং আইনগত সহায়তা দানকারীদের ফি হিসেবে। ওয়েজ আর্নারস ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডের অন্যতম লক্ষ্য হলো, অভিবাসীদের প্রি-ডিপার্চার ব্রিফিং প্রদান। কিন্তু প্রতিবছর গড়ে শুধুমাত্র ১৬.০২% অভিবাসী কর্মী ব্রিফিং পেয়ে থাকে।

৪.২ রিক্রুটিং এজেন্সী

বিএমইটির তথ্যমতে বর্তমানে ৯৩৫ টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সী রয়েছে। ২০১৫ সালে ৯৮টি রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে।

৪.৩ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৪৮ টি শাখা রয়েছে এবং বিমানবন্দরে একটি বুথ আছে। ২০১৫ সালে ৫,৩৮,৬৬৭ জনের বেশী অভিবাসী চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছেন, যার মধ্যে মাত্র ৫৪৬৩ জন এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সক্ষম হয়েছেন। এই ৫৪৬৩ জন যে ঋণ নিয়েছেন তার পরিমাণ হলো ৪৮,৬৯০,৬০০০ টাকা। অর্থাৎ ২০১৫ সালে যারা বিদেশ গেছেন, তাদের মাত্র ১ শতাংশ এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পেরেছেন। এই বছর শুধুমাএ ১৮ জন ফিরে আসা অভিবাসী ৪৮, ৮,০০০০ টাকা পুর্ণবাসন ঋণ গ্রহণ করেছে।

এই ব্যাংকটি ১০০ কোটি টাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর ৯৫ শতাংশ তহবিল দেওয়া হয়েছিল ওয়েজ আর্নার্স ওয়েল ফেয়ার ফান্ড থেকে। মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স যাচাই না করেই, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আরো ৩০০ কোটি টাকা ওয়েজ আর্নার্স ওয়েল ফেয়ার ফাণ্ড থেকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অথচ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালীণ শর্ত অনুযায়ী ব্যাংকের পরবর্তী মূলধন বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহীত হওয়ার কথা। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পারফরমেন্স মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন।

৪.৪ জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস

তৃণমূল পর্যায়ে অভিবাসীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি'র অধীনে বিভিন্ন জেলায় ৪৮টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস কাজ করছে। এসব অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মূল্যায়ণ করতে গেলে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক অফিস উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে এবং এই অফিসগুলোর প্রায় অর্ধেক পদ খালি রয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এসব অফিসের কর্মকর্তা/জনবল নিয়মিতভাবে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। এসব জেলা অফিসের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে কোন অফিস নাই।

৪.৫ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিএমইটির অধীনে মেরিন বিষয়ক ডিপ্লোমা সমমানের ৬ টিসহ ৫৩ টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)আছে। ২০১৫ সালে, জানুয়ারি থেকে জুন ৩০ এর মধ্যে ৮১,০০০জন অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ২০১৪ সালের ১২ মাসের মধ্যে যারা (৭৫০০০) প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, তার তুলনায় এটা দ্বিগুণ। টিটিসি থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তাদের সনদ স্বীকৃতির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আইওএম-এর সহায়তায় ব্রিটিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে চুক্তি করেছে।

৪.৬ লেবার এ্যাটাশে

লেবার অ্যাটাশেরা মূলত অভিবাসীদের গন্তব্যদেশ এবং তাদের মূলদেশের মধ্যে সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে ১৭ টি দেশে লেবার অ্যাটাশেরা নিয়োজিত আছেন। লেবার অ্যাটাশেদের সংখ্যার অপ্রতুলতা অভিবাসীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের পথে মূল বাধা। বাহরাইন এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে শতাধিক বাংলাদেশী বর্তমানে জেলে বিচারের জন্য অপেক্ষায় বা সাজা খাটছে অথবা তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এখন উচিত বিদেশে শ্রম বিভাগগুলোতে আরো নারী সদস্য নিয়োগ দেয়া। স্থানীয় ভাষাজ্ঞানের অভাব ও দোভাষী এবং আইনী পরামর্শক নিয়োগের জন্য অপ্রতুল অর্থায়ন সেসব দেশে অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

নাগরিক সমাজের ভূমিকা

গত কয়েক যুগ ধরেই নাগরিক সমাজ অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা অভিবাসন ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা যেমন সচেতনতা বৃদ্ধি, অভিযোগ দায়ের করা ও বিচার লাভে সাহায্য করা, আর্থিকভাবে জালিয়াতির শিকার হওয়া অভিবাসীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, ২০১৩ সালের অভিবাসন আইনের আওতায় বিভিন্ন আদালতে আর্থিক জালিয়াতির মামলা দাখিল করা, আটকে পড়া শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ক্যাম্পেইন করা, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করে আসছে। তারা বিভিন্ন নীতি সংস্কারের জন্য সরকারকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। কেবল ২০১৫ সালে ব্র্যাক, ওয়্যারবে ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং রামরু সম্মিলিতভাবে ১২০৩ টি প্রি-ডিসেশন বিষয়ক ট্রেনিং ও ১০৬ টি প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং প্রদান করেছে। সবমিলিয়ে এসব সংস্থা ২০৯টি অভিযোগের বিপরিতে মোট ১৩,৯০৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করেছে।

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ফিরে আসা অভিবাসীদের জন্য বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রামরু একটি অনলাইন চাকরীর পোর্টাল চালু করেছে। দেশের ভিতরে যেসব নিয়োগকারী রয়েছেন, তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই পোর্টাল চালু করা হয়েছে। বিদেশের সম্ভাব্য নিয়োগকারীরাও উক্ত পোর্টালে লগ ইন করে তাদের কাজের চাহিদামত দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক উক্ত পোর্টাল থেকে খুঁজে নিতে পারেন। এই ঠিকানায় (www.returneemigrant.info) এই জব পোর্টালে ঢোকা যাবে।

মানব চোরাকারবীদেরকে কেন ২০১৩ সালের অভিবাসন আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে না-মর্মে বিচার বিভাগীয় নির্দেশনা চেয়ে রামরু চলতি বছর ৫ মার্চ মহামান্য উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। এই জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষাপটে মহামান্য আদালত প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি রুল জারি করেন এবং চার সপ্তাহের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেন, কিন্তু এখনো সেটি হয়েছে কি-না তা জনসমক্ষে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

নাগরিক সমাজের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীরাও অভিবাসন খাতে কাজ করছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এসডিসি, আইএলও, আইওএম এবং ইউএন ওমেন অভিবাসন বিষয়ে কাজ করছে- এমন স্থানীয় সংগঠনগুলোকে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। ফিলিপাইন ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক পণ্ঢাটফরম মাইগ্রেন্টস ফোরাম ইন এশিয়া (এমএফএ) সক্রিয়ভাবে অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার কাজে যুক্ত রয়েছে। রামরু, ওয়্যারবী ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, এসিডি, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাথে ***এমএফএ*** অভিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোম্যাসি ট্রেনিং প্রোগ্রাম এসব কাজের মধ্যে একটি।

সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে রামরু, আইএলও, এসডিসি এবং **প্যানস** সাউথ এশিয়া বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজন করেছে। রামরু নেপাল ও ঢাকায় দু'টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে; যেখানে প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সংবাদিকদের সাথে তাদের অভিবাসন অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে ও যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে।

আসন্ন ৯ম গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট-জিএফএমডি'তে অভিবাসীদের অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করার লক্ষ্যে গত ৫ অক্টোবর বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও নাগরিক সংগঠনগুলো একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে। রামরু'র নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সি আর আবরার এই কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

সেকশন-৫

২০১৫: অভিবাসনে আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ

৫.১ গ্লোবাল মাইগ্রেশন প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য দিক

আইওএম সম্প্রতি গ্লোবাল মাইগ্রেশন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে নগরায়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে ২০১৪ সালে প্রায় ৫৪ শতাংশ মানুষ নগরে বাস করে এবং এর ধারাবাহিকতায় ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাড়াবে ৬.৫ বিলিয়ন। এই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে অভিবাসী এবং নগরের লাভের জন্য অভিবাসনও নগরায়ন পলিসি আরো ভালোভাবে ডিজাইন হতে পারে। এই প্রতিবেদন কতগুলো কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে; যা বাংলাদেশের মতো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রবণ দেশগুলোতে প্রয়োগযোগ্য।

৫.২ জাতিসংঘে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা গৃহীত হয়। এই দলিলে দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পরবর্তী ১৫ বছর কাজ করার জন্য ১৭টি নতুন লক্ষ্য এবং ১৬৯ টার্গেট টিক করা হয়েছে। এই দলিল ২০০০ সালে গৃহীত সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা শেষ হওয়ার প্রাক্কালে গৃহীত হলো।

এই লক্ষ্যমাত্র টেকসই উন্নয়নে অভিবাসী এবং তাদের ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উন্নয়ন এজন্ডা গৃহীত হওয়ার পর নিজ নিজ দেশের নীতি/পলিসিতে তার প্রতিফলনের ব্যাপারটি জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের ওপর নির্ভর করছে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জতিক পরিসরে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে এর অগ্রগতি মনিটরিংয়ের জন্য নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

৫.৩ অনিয়মিত অভিবাসন মোকাবেলায় ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভা

চলতি বছরে সমুদ্র পথে অনিয়মিত অভিবাসন সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে থাই সরকারের উদ্যোগে গত ২৯ মে ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট ১৭টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা শরণাথী এবং অভিবাসীদের জরুরী সঙ্কট মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করে। মানবপাচার ও মানব চোরাচালানসহ অনিয়মিত অবিবাসন সঙ্কট সমাধানে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ব্যাপারেও সেখানে আলোচনা হয়। এই আলোচনা সভায় সহযোগীতা, আন্তর্জাতিক বার্ডেন ভাগাভাগি এবং যৌথ দায়িত্বশীলতার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনিয়মিত অভিবাসন মোকাবেলায় একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এই সভা আইনের প্রয়োগ শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উৎস দেশে কার্যকর কাজ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে।

সিএনএন'র ১১ ডিসেম্বরের খবর অনুযায়ী, থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণ শঙ্খলা প্রদেশের জঙ্গলে গণকবর আবিস্কারের ঘটনা তদন্তে নেতৃত্বদানকারী উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা তার জীবনের ঝুঁকির প্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন।[৩] মেজর জেনারেল ***পভিন পঙ্গসরিন*** (Paween Pongsrin) রয়্যাল থাই পুলিশের এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা- যিনি মানবপাচারের ঘটনা তদন্তে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন- তিনি

[3] সিএনএন, রয়টার্স- ডিসেম্বর ১১, ২০১৫

মানবপাচার চক্রকে থাই আইনী ব্যবস্থার আওতায় এনেছিলেন। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মানবপাচার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাইল্যাণ্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছেন, এজন্য তিনি দেশ ছেড়েছেন। ২০১৫ সালের মে মাসে থাইল্যান্ডের জঙ্গলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী গণকবর আবিস্কারের ঘটনার পর তিনি তদন্ত শুরু করেছিলেন। তার নেতৃত্বেই থাই তদন্তকারী দল থাই আর্মি জেনারেল এবং স্থানীয় প্রভাবশালী কর্মকর্তাসহ প্রায় ৯০ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিলো। পরবর্তীতে, সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার, আর্মি এবং পুলিশের মধ্যেকার ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের দ্বারা আকস্মিকভাবে তার এই তদন্ত কাজ স্থগিত করা হয়। এসব ঘটনা ইঙ্গিত করছে যে, এই অনিয়মিত (অবৈধ) অভিবাসন সংঘটিত হচ্ছে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের মাধ্যমে এবং গন্তব্য দেশ, উৎস দেশ ও ট্রানজিট দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এ থেকে লাভবান হচ্ছে। সমুদ্রপথে অবৈধ অভিবাসনের এই ঘটনাবলী আমাদেরকে এই যুক্তি উপস্থাপনের শক্তি দিয়েছে যে, গতানুগতিক অভিবাসনের কারণ বিশ্লেষণে অভিবাসীর দারিদ্র্যকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আন্তর্জাতিক কর্মী সংগ্রহের প্রক্রিয়া, শ্রমিক প্রেরণকারী দেশগুলোর জনশক্তি সংগ্রহের পলিসির ওপর।

৫.৪ অনিয়মিত অভিবাসন বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্যোগ

ক্রম বর্ধমান অভিবাসনের প্রবণতা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে; যা কি-না মানবপাচার, মানব চোরাচালান ও অনিয়মিত অভিবাসনের ফলে ইউরোপীয় দেশসমূহের সীমান্ত এলাকায় মানবিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা গেছে। ফলে মে মাসের ১৩ তারিখ ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভিবাসন বিষয়ে একটি নতুন এজেন্ডা উত্থাপন করে। এতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝোতামূলক আস্থা ও সংহতির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়।

৫.৫ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যারিস সম্মেলন ও অভিবাসন

৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের প্যারিসে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে; যা কোপ ২১ নামে পরিচিত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ১৯৫টি দেশ কার্বন নি:সরণ কমিয়ে আনা এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি বাধ্যতামূলক আইনী চুক্তিতে আসার উদ্দেশে একত্রিত হয়েছিল। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসী এবং জলবায়ু পরিববর্তনজনিত অভিবাসন এর আগের খসড়া চুক্তিতে স্বীকৃত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসীদের অধিকার এর ভূমিকা অংশে স্থান পেয়েছিল; যার ফলে এর স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য তা আইনী বাধ্যবাধকতা তৈরি করেনি। চূড়ান্ত কসড়া প্রকাশ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসীদের অধিকার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ায় নাগরিক সমাজ তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

৫.৬ জিএফএমডি এবং ৯ম জিএফএমডির সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ

চলতি বছরের ১২ থেকে ১৫ অক্টোবর তুরস্কের ইস্বানবুলে ৮ম জিএফএমডি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ ১৫০ টি দেশের ৬০০ প্রতিনিধি অভিবাসন ও উন্নয়নের সম্পর্ক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিসরে বিশেষত গন্তব্য দেশসমূহের নীতি সংশ্লিষ্ট সঙ্কট বিষয়ে আলাচনা করেছেন। প্রথমবারের মতো, মেডিটেরিয়ানসহ সিরিয়ার চলমান শরণার্থী সঙ্কট এবং মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় আটকে পড়া ও অন্যান্য অভিবাসন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জিএফএমডিতে আলোচনা হয়েছে।

পরবর্তী অর্থাৎ ৯ম জিএফএমডি ২০১৬ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশ এর সভাপতিত্ব করবে। এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খুব দ্রুতই শুরু হবে, কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি সেখানে অংশগ্রহণ করবে।

সেকশন-৬

অভিবাসন গবেষণা হতে ২০১৫ সালে অর্জিত জ্ঞান

এসডিসি ও রামরু কর্তৃক প্রকাশিত বই *ইমপ্যাক্ট অব মাইগ্রেশন অন পোভারটি এণ্ড লোকাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ* (২০১৫) তে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে পুরুষদের অভিবাসন করতে গড়ে ব্যয় হয়েছে ৩,৮০,০০০ টাকা; যেখানে নারীদের ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় হয়েছে ১ লাখ টাকা।

পুরুষ অভিবাসীরা বছরে রেমিটেন্স প্রেরণ করেছেন ২ লাখ টাকার মতো। পক্ষান্তরে নারী অভিবাসীরা বছরে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন ৮০ হাজার টাকার মতো। যেখানে পুরুষ অভিবাসীর তুলনায় নারী অভিবাসীর উপার্জন কম, সেখানে তারা তাদের মোট আয়ের ৯০ শতাংশ রেমিট করেন। আর পুরুষরা রেমিট করেন তাদের আয়ের ৫০ শতাংশ।

অভিবাসী এবং অন-অভিবাসী পরিবারের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে, আন্তর্জাতিক অভিবাসী পরিবারে বাৎসরিক আয় ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। অনঅভিবাসী পরিবারের বাৎসরিক আয় হলো ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা; যেখানে জাতীয় গ্রামীণ গড় আয় হচ্ছে ১লাখ ১৫ হাজার টাকা।

বিবিএস'র তথ্য অনুযায়ী , গ্রামীণ জনসংখ্যার ২৬% লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। SDC-RMMRU গবেষণা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের মাত্র ১৩% পরিবার দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে অথচ অনভিবাসী পরিবারের ৪০% এবং আভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের ৪৬% পরিবার দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে।

ব্র্যাকের গবেষণা অনুযায়ী, অভিসন ইচ্ছুকদের ১ তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার শিকার এবং গড়ে তারা ২৫০ ইউএস ডলার পরিমাণ অর্থ হারান; যা ওই সব পরিবারের ৩ মাসের আয়ের সমান।

রামরু ও আরপিসি'র চলমান গগবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অভিবাসী পরিবার অনভিবাসী পরিবারের তুলনায় প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় অনেক বেশি অর্থ খরচ করেন। তবে, অনভিবাসী পরিবারের তুলনায় তারা উচ্চশিক্ষায় অনেক কম খরচ করে। এ থেকে দাবি করা যায়, অভিবাসন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিজ-ইনসেনটিভ হিসেবে কাজ করে। এই ফলাফল ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিক্ষা বিষয়ক ব্যকগ্রাউন্ড পেপারের ফলাফলের সম্পূরক। এই পেপারে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে যেসব সেক্টরে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, সেখানে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই। ফলে গ্রামীণ সমাজে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে যাবে।

২০০১ এবং ২০১১ সালের জনসংখ্যা জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে *এসসিএমআর* এবং রামরু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কতসংখ্যক লোক এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হবে, সে বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। সেখানে দাবি করা হয়, শুধুমাত্র বন্যা, সাইক্লোন, জলচ্ছাস, নদী ভাঙন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২০১১ হতে ২০৫০ সালের মধ্যে ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়ন বাংলাদেশী তার নিজ উৎস এলাকা হতে অভিবাসিত হবে।

সেকশন-৭

উপসংহার

১. সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারের একটি জাতীয় কৌশল নির্ধারণ করা উচিত।

২. গ্রামীণ তরুণদের জন্য উচ্চশিক্ষাকে একটি প্রণোদনা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জীবনমুখী দক্ষতা হিসেবে তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত।

৩. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে- উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের উচিত সব ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনার অনিবার্য অংশ হিসেবে অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ৯ম জিএফএমডি সফলভাবে অনুষ্ঠানের জন্য শুরু থেকেই নাগরিক সমাজের সহযোগীতা গ্রহণ করা উচিত।